The Daily Janakantha/ 21, 22, 23 Nov 2014

কৃষিজমিতে ভূমিখেকোদের আগ্রাসন ১ ॥ দানবের থাবা

০ চাষের জমি দ্রুত চলে যাচ্ছে অকৃষি খাতে

০ মামলা-মোকদ্দমায় অস্থির জমির মালিকরা

০ বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করে না ভূমিদস্যুরা

০ প্রশাসন নীরব

রাজন ভট্টাচার্য ॥ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জৈনাবাজার থেকে গাজীপুর ইউনিয়নের শ্রীপুর উপজেলার শৈলাট গ্রামে যাওয়ার পথে প্রায় ১০ কিলোমিটার পাকা রাস্তার উভয় পাশের কৃষিজমির স্মৃতিচিহ্ন দিন দিন মুছে যাচ্ছে। এখানকার প্রায় সব কৃষিজমিই দ্রুত অকৃষি খাতে যাচ্ছে। দখলের থাবা থেকে বাদ যাচ্ছে না কবরস্থান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমিও। এ সব জমিতে নির্মাণ হচ্ছে শিল্প, বাণিজ্যিকসহ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা। এলাকায় কৃষিজমিকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের বিধিনিষেধেরও তোয়াক্কা করছেন না কেউ। নীরব প্রশাসন। গাজীপুর ইউনিয়নের বেশিরভাগ কৃষিজমির চিত্র এটি! এর মধ্যে মেসার্স টোটাল কেয়ার প্লাটিনাম লিমিটেডসহ একই ব্যক্তির চার প্রতিষ্ঠানের নামে জমি দখল, স্থানীয়দের উচ্ছেদ, হামলা, মামলাসহ অত্যাচার নির্যাতনের অভিযোগের শেষ নেই। এ সব কারণে শৈলাট, গাজীপুর ও নয়াপাড়া এই তিন গ্রামের মানুষ এখন দিশেহারা। গ্রামবাসী জমি দখলের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেও প্রশাসন তাদের পাশে নেই। জনস্বার্থে এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন। এলাকাবাসীর যত অভিযোগ চার প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আলী হায়দার রতনের বিরুদ্ধে। তাঁরা বলছেন, তিন গ্রামের ৩৫০ একর কৃষিজমি ইতোমধ্যে দখলে নিয়েছেন তিনি। মিথ্যা দলিলপত্র তৈরি করে ইতোমধ্যে ৫০০ একর জমির নামজারি করে নিয়েছেন। জমি দিতে রাজি না হওয়ায় ৩০০ পরিবারের বিরুদ্ধে একুশটির বেশি মামলা দেয়া হয়েছে। প্রতিবাদ করলে পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হয়। সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে হামলা করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। স্থানীয়দের ভয় দেখিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে গোটা এলাকায়। প্রশাসন, ভূমি অফিসসহ সংশ্লিষ্টদের হাত করেই ২০০৮ সাল থেকে তিনি এ সব অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সবার কাছে তিনি ভূমিদস্যু রতন হিসেবে পরিচিত।

এ সব বিষয়ে জানতে চাইলে মেসার্স টোটাল কেয়ার প্লাটিনাম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আলী হায়দার রতন জনকণ্ঠের কাছে তাঁর বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এ সব অপপ্রচার। তিনি বলেন, গাজীপুর ইউনিয়নের শৈলাট, গাজীপুরসহ নয়াপাড়া গ্রামে আমার কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান নেই। দুই-একটি জমি কিনেছি মাত্র। কোন জাল দলিল করিনি। কারও জমি বলপূর্বক হাতিয়ে নেয়ার ঘটনাও নেই। তিনি বলেন, এলাকায় কেউ জায়গা জমি কিনতে গেলেই তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে জমি দখলসহ নানা অপপ্রচার চালানো হয়। বিশেষ করে একশ্রেণীর জমির দালাল চক্র এ সব অপপ্রচারে লিপ্ত। তিনি বলেন, জমি কেনার পর দখল নেয়ার সময় স্থানীয় লোকজন বাধা দেয়। তখন তাদের বাড়তি অর্থ দিতে হয়। অর্থাৎ একই জমি বারবার কিনতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ যাচাই-বাছাইয়ের পরামর্শ দেন তিনি। স্থানীয় লোকদের হুমকিসহ পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে হয়রানির অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, আমি কাউকে হুমকি দেইনি। নানা অভিযোগ নিয়ে কেউ কেউ প্রশাসনের আশ্রয় নেয়ার পর তদন্ত শেষে সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তখন একশ্রেণীর সুবিধাবাদী লোক প্রশাসনকে বিশ্বাস করে না। উচ্চপর্যায়ে অভিযোগ করেন। এর আগেও বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সহযোগিতায় আমার বিরুদ্ধে মানববন্ধন, সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

গাজীপুর ইউনিয়নে মোট জমির পরিমাণ ১১ হাজার ৪২০ একর। শৈলাট গ্রাসের বাসিন্দা নূরুল ইসলাম সরকার জানান, একটি বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সরকারদলীয় লোকজনসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তিন গ্রামে শিল্পায়নের নামে একের পর এক কৃষিজমি বেদখল হচ্ছে। তিনি জানান, জমি না দেয়ায় বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কেনা জমিতে মাটি

ফেলায় আশপাশের কৃষিজমি নষ্ট হচ্ছে। প্রতিবাদ করলে মামলা ও পুলিশ দিয়ে হয়রানি করা হয়। সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে হামলা করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তিন গ্রামের বাসিন্দাদের ভয় দেখিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে।

টোটাল কেয়ার ও প্লাটিনাম নামের দুটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি অত্যাচার অবিচারের শিকার হচ্ছেন। তাদের কারণে কৃষিজমি নিয়ে এলাকায় থাকা এখন দায়। গ্রামবাসীর কৃষিজমি রক্ষায় এগিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দা এ্যাডভোকেট লুৎফর রহমান। এ জন্য তাকেও জীবননাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে। জীবনের নিরাপত্তা দাবি করে পুলিশের মহাপরিদর্শক বরাবর আটটি মানবাধিকর ও উন্নয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি দেয়া হয়েছে সম্প্রতি। লুৎফর অভিযোগ করে বলেন, আলী হায়দার রতন নামের এক শিল্পমালিক ৩৫০ একর কৃষিজমি দখলের চেষ্টা করছেন। সাধারণ মানুষের ভূমি রক্ষায় মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ দাখিল করার পর আমাকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসনের কৃষিজমি দখলে সহযোগিতা করারও অভিযোগ করেন তিনি। অব্যাহত হত্যার হুমকির মুখে চলতি বছরের ১৯ জুলাই জয়দেবপুর থানায় জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে জিডি করেন তিনি (নম্বর-১৩৭২)।

বিভিন্ন বেসরকারী ও মানবাধিক সংগঠনের এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের তিনটি গ্রামে একই ব্যক্তি ও তাঁর সহযোগীরা নিরীহ কৃষিজীবী ও গ্রামবাসীর জমি হাতিয়ে নিচ্ছে। মিথ্যা দলিলপত্র তৈরি করে ইতোমধ্যে ৫০০ একর জমির নামজারি করে নিয়েছে। দখল করে নিয়েছে ৩০ বিঘার বেশি জমি। শিল্পপার্ক স্থাপনের নামে আরও এক হাজার ২০০ একর জমি হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে। বেদখলে বাধা দেয়ায় ভাড়াটে গু-া দিয়ে আক্রমণ, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি এমনকি প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়া হচ্ছে। এ জমিগুলোর বেশিরভাগই কৃষি খাতের। রয়েছে বসতভিটা, কবরস্থান, মসজিদ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জমিও। বেসরকারী গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়— শৈলাট এলাকার নিরীহ গ্রামবাসীর প্রায় ৮০০ বিঘা জমি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটি নিজস্ব ক্যাম্পাসের জমি ও পুকুর ভরাট করে নিচ্ছে আলী হায়দার রতন। আলাউদ্দিন আলী ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে একজন। স্থানীয় গ্রামবাসী প্রতিবাদ করায় তাদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে দস্যু বাহিনী। সব মিলিয়ে এই এলাকার প্রায় এক হাজার ২০০ একর জমি একই ব্যক্তির মালিকানাধীন চারটি কোম্পানি অবৈধ প্রক্রিয়ায় দখলের পাঁয়তারা করছে।

গাজীপুর ইউনিয়নের তিন গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, জবান আলী মাস্টারের জমি ভুয়া খতিয়ান তৈরি করে দখলে নেয় শিল্পপতি রতন। খতিয়ান সূত্রে ১১ বিঘা জমির মালিক ডা. আবু সাঈদ। ২০০৯ সালে রতন ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করে জমিটি হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। তখন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের হস্তক্ষেপে জমিটি ফিরিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে আবারও ভুয়া ওয়ারিশ তৈরি করে জমিটি হাতিয়ে নেয়া হয়।

বেহাত হলো যাদের জমি ॥ বেসরকারী ও মানবাধিকার বিভিন্ন সংগঠনের জরিপে দেখা গেছে— গাজীপুর গ্রামের পুলিশের সাবেক ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মোঃ তোফাজ্জল হোসেনের চার বিঘা কৃষিজমি, একই ইউনিয়নের বানেছা বেগমের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি মিলিয়ে প্রায় তিন বিঘা, মোবারক হোসেনের এক বিঘা কৃষিজমি, মাওলানা মোহাম্মদ আবদুল মজিদের দুই বিঘা কৃষিজমি, মতি মিয়ার আট বিঘা কৃষিজমি, শৈলাট গ্রামের মোঃ শাহজাহানের তিন বিঘা কৃষিজমি, একই গ্রামের আব্দুর শুকুর মাস্টারের ১১ বিঘা কৃষিজমি, জবান আলী মাস্টারের ৪ বিঘা কৃষিজমি, মোসাম্মত মিতু গংয়ের চার বিঘা কৃষিজমি, মোঃ মিজানুর রহমান মিজার এক বিঘা কৃষিজমি, মোঃ মজিবুর রহমান গংয়ের বসতবাড়ি ও সাইল জমি মিলিয়ে ১৬ বিঘা, মোসাম্মাত ফরিদা খাতুনের আট গ-া কৃষিজমি, মোঃ মোফাজ্জল হোসেন গংদের চালাসহ ২ বিঘা জমি, মোঃ জমির উদ্দিনের ১৭ শতাংশের বেশি চালা, জালাল উদ্দিন গংদের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি মিলিয়ে চার বিঘা, মোঃ মুক্তার আলীর এক বিঘা কৃষিজমি, ছাবদুল আলী গংদের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি মিলিয়ে দুই বিঘা, হেলাল গংদের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি মিলিয়ে তিন বিঘা, আফসার উদ্দিন গংদের বসতবাড়ি, পুকুর, কৃষিজমি মিলিয়ে ১৬ বিঘা, হারুন মিয়াদের ১৫ বিঘা কৃষিজমি, ফজলুল হক গংদের দুই বিঘা কৃষিজমি, আবুল কাশেম গংদের ১০ বিঘারও বেশি কৃষিজমি, নূরুল ইসলাম গংদের

বসতবাড়ি ও কৃষিজমি মিলিয়ে আট বিঘা, বেলাল উদ্দিনের বসতবাড়ি, পুকুরসহ কৃষিজমি মিলিয়ে তিন বিঘা, হেলাল উদ্দিনের বসতবাড়ি, পুকুরসহ কৃষিজমি মিলিয়ে প্রায় তিন বিঘা ও জুলহাস গংদের কৃষিজমি দুই বিঘা নানা কায়দায় হাতিয়ে নিয়েছে ভূমিদস্যু চক্র।

এছাড়াও শৈলাট গ্রামের আবদুল বারেকের এক বিঘা কৃষিজমিসহ একই গ্রামের আবুল কালাম গংদের দুই বিঘা কৃষিজমি, ডাঃ মোঃ আবদুল আজিজের বসতবাড়ি ও কৃষিজমি মিলিয়ে দেড় বিঘা, একই গ্রামের আবদুল আজিজের দেড় বিঘা জমি, আবদুল মজিদের পুকুর, বসতভিটা ও কৃষিজমি মিলিয়ে তিন বিঘারও বেশি, মোঃ ইব্রাহিম গংদের চার বিঘা, আশরাফ খানের এক বিঘা, জয়নাল আবেদীনের ১৭ শতাংশেরও বেশি, শওকত আলীর দুই বিঘা, হাইজলের দুই বিঘা, হাসমত আলী খাঁর ৫ বিঘা, আম্বিয়া খাতুনের আট শতাংশের বেশি, তাজুল ইসলাম গংদের তিন বিঘারও বেশি, মিল্টন গংদের দুই বিঘাসহ এলাকার অসংখ্য মানুষের কৃষিজমি থেকে শুরু করে বসতবাড়ি, পুকুর, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ কবরস্থানের জমি দখলে চলে গেছে।

দখলের কবলে কবর ও মসজিদের জমিও ॥ শৈলাট গ্রামের সালাম পুলিশ গং অভিযোগ করেন, তাঁর পুকুর, বাড়ি, সাইল জমি, মসজিদ, ঈদগাহ মাঠ, কবরস্থান মিলিয়ে ৩৭ বিঘা জমি দখলে দেয়ার চেষ্টা চলছে। বারবার চেষ্টা করেও কবরসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জমি রক্ষা সম্ভব হয়নি। একই গ্রামের আম্বিয়া খাতুন বলেন, গোরস্তানের পাশে আমার ৯ গ-া জমি দখল করে নিয়েছে আলী হায়দার রতন। জমিতে গেলে তার লোকজন লাঠিসোটা আর ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধাওয়া করে। আমাকে বলে, এই জমির যে দলিল তোমার কাছে আছে সেটা সঠিক নয়।

রতনের বিরুদ্ধে প্রায় শত মামলা ॥ ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে এলাকাবাসীর জমি হাতিয়ে নেয়ায় টোটাল কেয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রতনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ৭০টির বেশি মামলা রয়েছে। এছাড়াও দেওয়ানী আদালতে আছে দশটির বেশি মামলা। এদিকে এলাকাবাসীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে প্রায় ৩০ ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করেছেন রতন।

দুই প্রতিষ্ঠানের নামেই ৩০০ একর জমি ॥ স্থানীয় ভূমি অফিসের লোকদের হাত করে স্থানীয় বাসিন্দাদের জমির মালিকানা বদল করা হয়েছে। অথচ যারা জমির প্রকৃত মালিক তাঁরা খবরই রাখেন না। বিশেষ কোন প্রয়োজনে জমির খোঁজ নিতে গিয়েই সন্ধান মিলছে নিজের জমি বেহাত হওয়ার। ভুয়া মিউটেশনের মাধ্যমে মালিকানা বদলে বসেছে অন্য কারও নামে। মাওনা ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এখন আলোচিত জমির মালিক আলী হায়দার রতন। মেসার্স টোটাল কেয়ার ও প্লাটিনাম লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলী হায়দার রতনের নামে জমি খারিজ করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের নামে সাড়ে ৩০০ একর জমি রতন খারিজ করেছেন বলে জানা গেছে। এছাড়াও তাঁর মালিকানাধীন আরও দুটি প্রতিষ্ঠান তো রয়েই গেছে। ২০১০ সাল থেকে চলতি বছর বিশাল এই পরিমাণ জমির মালিকানা পরিবর্তনের দাবি তাঁর বিরুদ্ধে। অথচ গাজীপুর জেলায় আইনের নির্ধারিত সিলিং অনুযায়ী একই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে ৬০ বিঘার বেশি জমি কেনা যাবে না। অথচ প্রশাসনের নাকের ডগায় অপকর্ম করে বেড়ালেও রতনের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

নামজারি ও জমাভাগের নথি নং-৩০৫৮/১০-১১ তারিখ ২৯ মে ২০১১ অনুযায়ী শৈলাট মৌজার দুই একর পৌনে চার শতক সাইল জমির মালিকানা পরিবর্তন করা হয়। এছাড়াও নামজারি ও জমাভাগ নথি নং-৩০০৩/১০-১১ ২০১২ সালের ২৪ মের নথিতে দেখা গেছে, শ্রীপুর মৌজার ৫৮ শতক জমি খারিজ করা হয়েছে। ২০১২ সালের ৪ জানুয়ারি নথি নং-১৮০৪/১০-১১ অনুযায়ী শ্রীপুর মৌজার ২০০ একরের বেশি জমি খারিজ করার রেকর্ড পাওয়া গেছে। ভূমি অফিস থেকে সংগৃহীত প্রায় ৭০ নথিতে বিশাল জমির মালিক হিসেবে রতনের নাম উল্লেখ রয়েছে। ভূমি হাতছাড়া মালিকরা বলছেন, ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে বেশিরভাগ জমির মালিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে।

শৈলাট গ্রামের বাসিন্দা আবদুস সালামের দায়ের করা জমি জালিয়াতির মামলায় বলা হয়, শৈলাট মৌজার খতিয়ান ১৩০,

আরএস খতিয়ান ২২৯ এর দুই বিঘা জমি তিনি বিক্রি করেননি। স্থানীয় ভূমি অফিস থেকে আলী হায়দার রতন এই জমি খারিজ করে নিজের নামে করে নেয়। এর প্রেক্ষিত্রে আবদুস সালাম শ্রীপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর ভুয়া জমি নামজারির অভিযোগে রতনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এদিকে ২০০৯ সালে স্থানীয় বাসিন্দা মহব্বত আলী মাস্টার টোটাল কেয়ারের কাছে সাত বিঘা জমি বিক্রি করেন। এরপর ২০১০ সালে একই প্লটের দুই বিঘা জমি জোর করে দখল করে নেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রতন। জমি দখলের প্রতিবাদ করায় মহব্বত আলীর ছেলে মোঃ লুৎফর রহমানের বিরুদ্ধে ২০১১ সালের সাত এপ্রিল শ্রীপুর থানায় চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করেন তিনি।

একই বছরের ১৮ মে গাজীপুর জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে এ মামলার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। জমি দখলের প্রতিবাদ করায় মহব্বত আলী মাস্টারের ছেলের বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করায় বৈঠকে পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

২০১০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর গাজীপুরে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। এতে শ্রীপুর পৌর মেয়র আনিসুর রহমান বলেন, এখানকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল হলেও ভূমি দস্যুদের কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত হচ্ছে। যারা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। একই বৈঠকে র‌্যাব-১ এর উপ-পরিচালক মেজর নিশাত ভূমি দখলের বিষয়টি তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের শৈলাটসহ তিন গ্রামের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলাগুলো নিষ্পত্তির দাবি জানান।

২০১০ সালের ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত গাজীপুর জেলা শান্তিশৃঙ্খলা কমিটির বৈঠকে জেলা প্রেসক্লাব সভাপতি মাযহারুল ইসলাম বলেন, গাজীপুর ইউনিয়নের শৈলাটে আলী হায়দার রতন ও তাঁর বাহিনী মেসার্স টোটাল কেয়ার প্লাটিনামের নামে শিল্পপার্ক স্থাপনের জন্য সাধারণ মানুষের জমি দখল, ভুয়া দলিল বানিয়ে জমি হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জড়িত আছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাস্তবায়নকারী কমিটি জেলা তথ্য অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে বিষয়টি তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দিন দিন অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে।

এছাড়া শৈলাটের বাসিন্দা হেলাল ও বেলালের কাছ থেকে ৯ শতাংশ জমি কেনেন রতন। অথচ ১৩৮৭২/৭৩ নম্বর দলিলে নয় শতকের পরিবর্তে বেলালের কাছ থেকে ১৩৭ ও হেলালের কাছ থেকে ১২০ শতক জমি লিখে নেয়। পরবর্তীতে শ্রীপুর থানায় বেলাল ২০০৯ সালের ২১ নবেম্বর রতনসহ চারজনকে আসামি করে জিডি করেন। একই বছরের ২৭ নবেম্বর একই থানায় হেলাল একই আসামিদের বিরুদ্ধে জিডি করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল ভুয়া জাল দলিল তৈরি করে ও হত্যার হুমকি দিয়ে জমি হাতিয়ে নেয়া। এতে হাল ছাড়েননি চতুর রতন। ২০১৩ সালের ২২ আগস্ট ১১৩৮৯/৯০ নং দলিলে বেলাল-হেলাল দুই ভাই, চার ছেলে, দুই স্ত্রীসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়ে পুরো জমিই ৬৬ লাখ টাকায় দলিল করিয়ে নেয়। এর মধ্যে এখনও বকেয়া ৪০ লাখ টাকা। অথচ লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে বেলাল ও হেলালের পরিবারকে।

২

কৃষিজমিতে ভূমিখেকোদের আগ্রাসন ২ ॥ শিল্পায়ন-আবাসনের চাপে কুঁকড়ে গেছে কেরানীগঞ্জ

একদার দিগন্তজোড়া সবুজের ক্ষেতে এখন ঝুলছে অসংখ্য রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সাইনবোর্ড

রাজন ভট্টাচার্য ॥ এক সময়ে কেরানীগঞ্জের চারপাশ জুড়ে ছিল কৃষিজমি, খাল-বিল, নদী জলাভূমি আর ছোট-বড় ডোবা। এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকা ছিল কৃষিনির্ভর। দিগন্ত জোড়া ছিল সোনালি ধান। উৎপাদনও ছিল ব্যাপক। পর্যাপ্ত জলাশয়

থাকায় মাছের অভাব ছিল না। প্রায় ২০ বছরের ব্যবধানে বদলে গেছে এলাকার মানচিত্র। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, জমি দখল, হাজার গুণ অর্থের বিনিময়ে জায়গা বিক্রি, নদীভাঙ্গা মানুষের বসতিসহ নানা কারণে আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে জমি। এলাকায় রয়েছে অর্ধশতাধিকেরও বেশি বাড়ি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ম্য। আছে শতাধিক জমির দালাল ও জালিয়াতি চক্রের বিশাল সিন্ডিকেট। যাদের কাজই হলো সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জমি বিক্রীতে রাজি করানোসহ নানা কায়দায় জমি হাতিয়ে নেয়া। প্রতিবাদ করলে মামলা হয়। নয়তো হত্যার হুমকি। নদীর বুকেও ঝোলানো হয়েছে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির অসংখ্য সাইনবোর্ড। রাজধানীর কাছাকাছি হওয়ায় গোটা কেরানীগঞ্জজুড়েই এখন জমি কেনা, দখল ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। অথচ জমি কেনা/অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন আইনই মানা হচ্ছে না। এ সব বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনও নির্বিকার।

সব মিলিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে এলাকার জীববৈচিত্র্য। ভরাট হয়ে গেছে প্রায় ৭০ ভাগ জলাশয়। প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র সাড়ে ১৬ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে অন্তত এক ভাগের বেশি বেহাত হয়ে গেছে। এছাড়া দুই হাজার ১০০ একর সরকারী খাস কৃষিজমিও পুরোটাই বেদখলে। সেতুই নদীর ১০ কিলোমিটার কৃষিজমি দখলে নিয়েছে স্থানীয় ভূমিদস্যুরা। বারোটি ইউনিয়নের গ্রামে গ্রামে এখন কৃষিজমি কেনার হিড়িক পড়েছে। এক সময়ে রাজধানীর চার ভাগের একভাগেরও বেশি সবজি ফলন হতো এ এলাকায়। তাও হ্রাস পেয়েছে। সঙ্গতকারণেই পেশা পরিবর্তন করছেন কৃষকরা। সব মিলিয়ে জমি, ফসল আর প্রকৃতির স্মৃতিচিহ্ন মুছে যাচ্ছে এলাকা থেকে। স্থানীয়দের আশঙ্কা এভাবে বেহাত হতে থাকলে আগামী পাঁচ বছর পর কেরানীগঞ্জ থানায় কৃষিজমির স্মৃতিচিহ্নও মুখে যাবে।

কৃষিজমি রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল বাশার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, উপজেলায় দুই হাজার ১০০ একর সরকারী খাস জমি রয়েছে। এর বেশিরভাগই ফসলি জমি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরিপ শেষে সরকারী খাস জমি ইতোমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। বেহাত হওয়া এসব জমি উদ্ধারে অভিযান চলমান। আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে দখল হওয়া সকল সরকারী খাস জমি উদ্ধার করতে পারব। সার্বিকভাবে কৃষিজমি কিভাবে রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারেও প্রশাসন সচেষ্ট।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানের (ড্যাপ) আওতায় হলেও নতুন নতুন বসতি আর ভূমিদস্যুদের থাবায় এরই মধ্যে অধিকাংশ কৃষিজমি রূপান্তরিত হয়েছে আবাসিক ভূমিতে। বাদ যাচ্ছে না পতিত জমিও। প্রশাসনের নীরবতায় হাউজিং কোম্পানিগুলো বেপরোয়া। বাহারি নামে গড়ে ওঠা এ সব হাউজিং কোম্পানিগুলো একের পর এক জলাশয় ভরাট করছে। দখল করে নিচ্ছে সরকারী খাস জমি। আইন অমান্য করে জমি ভরাট ও অপরিকল্পিতভাবে বহুতল ভবন নির্মাণ করায় মাঝারি ভূমিকম্পে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

আবদুল্লাহপুরের হাজী আবদুল হান্নান শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন শেষে এখন বয়সে বৃদ্ধ। ৭০ বছরের বেশি সময় কাটিয়েছেন কেরানীগঞ্জে। তিনি জনকণ্ঠকে বলেন, চোখের সামনে দেখলাম অনেক কিছু। এক সময়ে পুরো এলাকায় কৃষিপণ্য উৎপাদিত হতো। দেখলে দেখতে কেমন করে বদলে গেল সবকিছু। যেন ঘুমের পর সকাল হলো। চোখ মেলে দেখলাম সবকিছু পরিবর্তন আর পরিবর্তন। মুক্ত মাঠ, খোলা বাতাস, দিগন্তজোড়া সর্ষেক্ষেত কোন কিছুই এখন আর নেই। এখন পুরান দিনে ফিরে গেলে বিশ্বাস হয় না এক সময়ে জমিগুলোতে ধান হতো। নবান্ন উৎসবে মেতে উঠত এলাকার মানুষ। ফাঁকা জমিতে বসত মেলা।

উপজেলা ভূমি অফিস সূত্রে জানা গেছে, কেরানীগঞ্জ উপজেলায় মোট জমির পরিমাণ ৪১ হাজার ৩ শ্রু ৪৭ একর। এর মধ্যে কৃষিজমির পরিমাণ- ১৬ হাজার ১ শ্রু ৯৮ হেক্টর। পতিত জমি ৭ শ্রু ৩৫ হেক্টর হলেও বর্তমানে কমে এসেছে কৃষিজমি। এক সময়ে যে জমিগুলোতে ফলত সোনালি ফসল এ এখন তা রূপ নিচ্ছে বহুতল ভবনে। এরই মধ্যে আবাদি জমি দখল করে সবুজ ছায়া, রাজউকের ঝিলমিল, বসুন্ধরা, জমিদার সিটি, আনোয়ার রিয়েল এস্টেট, সুমনা হাউজিং, স্টার পাস, নবধারা,

কিংডম, নিরাপদ সিটি, নিউ ভিশন, সর্দার ডেভেলপ, প্রিয় প্রাঙ্গণসহ বিভিন্ন নামে গড়ে তোলা হয়েছে অর্ধ শতাধিক আবাসিক প্রকল্প।

এ বিষয়ে আলাপ কালে এলজিইডির সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী শেখ তুহিন জানান, ঢাকা জেলার এ উপজেলাটিকে সরকার ড্যাপের আওতায় নিলেও কেউ আইন মানছে না। সেই সঙ্গে নেই রাজউকের নজরদারি। যে কারণে বেপরোয়া আবাসিক কোম্পানিগুলো। বালু দিয়ে নিচু জমি ও জলাশয় ভরাট করে সেখানে স্থাপন করা হচ্ছে ঝুকিপূর্ণ বহুতল ভবন। এখনই যদি এ বিষয়ে নজর দেয়া না হয় তাহলে ভবিষতে দেখা দেবে চরম বিপর্যয়। মাঝারি ভূমিকম্পে ঘটতে পারে প্রাণনাশের ঘটনা।

ঢাকার অতি সন্নিকটে ও বুড়িগঙ্গায় একাধিক ব্রিজ হওয়ায় সকলের নজর কেরানীগঞ্জের দিকে। কেরানীগঞ্জে নতুন নতুন বসতিদের জমির চাহিদার কারণে অনেকেই বিভিন্ন ব্যবসা ছেড়ে ঝুঁকেছেন জমি ব্যবসার দিকে। এ ব্যবসা করে অনেকেই রাতারাতি অঙ্গুল ফুলে কলাগাছে রূপান্তরিত হলেও থেমে নেই জমি জালিয়াতি চক্র। এ চক্রটি একই জমি একাধিক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে লুটে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা। প্রতারিতরা শেষ আশ্রয় হিসেবে ছুটছে থানায়। আগতদের অভিযোগ রেকর্ড না করে বিবাদী পক্ষকে ডেকে আনা হয় থানায়। থানার বড়কর্তা থেকে শুরু করে উপপরিদর্শকরা দিনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেন জমিসংক্রান্ত বিচার সালিশে। যে কারণে এ উপজেলায় দেখা দিয়েছে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি। বেড়েছে হত্যার ঘটনাও। যার বেশির ভাগই ঘটছে জমিসংক্রান্ত বিবাদের জের ধরে।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাহারি নামে গড়ে ওঠা এ সকল হাউজিং কোম্পানি জমি ক্রয় না মাসিক ভাড়ায় জমিতে সাইনবোর্ড লাগিয়ে তা গ্রাহকদের কাছে প্রতারণার মাধ্যমে প্লট বিক্রি করছে। প্রশাসনিক ঝামেলা এড়াতে অনেকেই রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তা ও কথিত সাংবাদিকদের বিনামূল্যে প্লটও দিয়েছে। ফলে হাউজিং কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগ অপকর্মই থেকে যাচ্ছে অজানা।

বাসতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শামসুল হক জনকণ্ঠকে বলেন, এলাকার সিতুই নদী কোন এক সময় সিংহের মতো গর্জন করত। স্বাধীনতার পর থেকে কতিপয় ভূমিদস্যু প্রভাব খাটিয়ে নদীর বুক পর্যন্ত দখল করতে শুরু করে। সরকারের নিয়ম নীতির কোন তোয়াক্কা করেন না তারা। বলতে গেলে নদীর বেশিরভাগ অংশই ছিল কৃষিজমি। নদীর তীরে ধান, পাট, আলুসহ বিভিন্ন রকম রবি শস্য উৎপাদন হতো। এখন প্রায় নদীয় ১০ কিলোমিটার জুড়ে নদীর জমির কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই। বন্ধ হয়ে গেছে কৃষি উৎপাদন। নানা খাতে বেহাত হয়েছে বিশাল জমি। অথচ প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করছে।

শুভাঢ্যা ইউনিয়নের চরকুতুবপুর গ্রামের বাসিন্দা হাজী আবদুল করিম (৯০) জানান, ছোটবেলায় শুভাঢ্যার খরস্রোতা নদীতে গোসল করা, মাছ ধরার ইতিহাস মনে হলে কষ্ট হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রাকৃতিক সবকিছুই বদলে গেছে। নগরায়নে প্রকৃতি চলে গেছে নাগালের বাইরে। এলাকার ধানক্ষেতে ঘুড়ি উড়ানো এখন স্বপ্ন। যেদিকেই তাকাই শুধুমাত্র দখল আর দখল। আগের মতো কিছু নেই। জমি নেই, জলা নেই, নদী নেই সবকিছুকে গলাটিপে যেন হত্যা করা হয়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে প্রকৃতি। এলাকার জলাশয় ধ্বংসের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে মাছ। কমেছে সবজি চাষ।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, ঢাকা মাওয়া সড়কের দুই পাশের রাস্তায় এখন আর এক ইঞ্চিও খালি জমি নেই। এক সময় রাস্তার দুই পাশের সবই ছিল কৃষিজমি। সিরাজদিখান, শ্রীনগর, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ রাস্তার পাশে এখন সাইনবোর্ড আর সাইনবোর্ড। রিয়েল এস্টেট, শিল্প কারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে এসব জমি অকৃষিখাতে চলে গেছে। নির্মাণ করা হচ্ছে বহুতল ভবন। এক সময়ে কেরানীগঞ্জসহ আশপাশের এলাকায় এক হাজার ২০০ টাকা শতক জমি বিক্রি হতো। এখন প্রতিশতক জমি বিক্রি হচ্ছে ১০ লাখ টাকারও বেশি। চলমান অবস্থায় আগামী পাঁচ বছর পর কেরানীগঞ্জ জেলার আর কোন কৃষিজমি থাকবে না বলে মনে করেন এলাকাবাসী।

নদীভাঙ্গা মানুষের নীরব বসতি ॥ শিল্পায়ন ও নগরায়নের কারণে এ এলাকার জমি যেমন দখল হয়েছে তেমনি নদীভাঙ্গনের

শিকার আশপাশের জেলার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে কেরানীগঞ্জে। মূলত জমির দাম কম হওয়ায় সহজেই বসতি স্থাপন করেছেন তারা। এ সুযোগ কাজে লাগিয়েছে ভূমিহীন মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন রয়েছে। প্রায় ১০ লাখ মানুষের বসবাস উপজেলায়। রাজধানীর খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে দ্রুত সময়ে জমির খাত পরিবর্তন হয়, শিল্পায়নের কারণে। সেই খরস্রোতা পদ্মার করাল গ্রাসে ভিটেমাটি হারিয়েছে- শরীয়তপুর, মাদারীপুর, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জসহ আশপাশের জেলার মানুষ। তখন অল্প টাকায় জমি কিনে তারা এখানে বসতি স্থাপন করে। কেউবা খাস জমিতে বসবাস শুরু করে। পরে এসব জমি ভূমিহীন মানুষদের বন্দোবস্ত দেয়া হয়। ফলে কৃষিজমি কমে যায়। বসতিছাড়া বেশিরভাগ মানুষই কৃষিজমিতে বাস করতে শুরু করেন। কেরানীগঞ্জ শহরের কালীগঞ্জ বাজারে ১০ সহস্রাধিক শিল্প-কারখানা যেখানে গড়ে উঠেছে এক সময় তা ছিল কৃষিজমি। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের অনেক মানুষ এ উপজেলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। তারা এখন শিল্প-কারখানার শ্রমিক।

কৃষকের পেশা বদল ॥ এ উপজেলায় ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে এখন শুভাঢ্যা, আগানগর, জিঞ্জিরাসহ আংশিক কালিন্দি ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি কৃষিজমি রয়েছে। গেল দুই থেকে তিন বছরে ইউনিয়ন পর্যায়ে ছড়াচ্ছে গার্মেন্ট। বলতে গেলে এ সব ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এখন গার্মেন্ট শিল্প স্থাপনের জন্য রীতিমতো জমি কেনার প্রতিযোগিতা চলছে। বেশি অর্থ লাভের আশায় ভূমি মালিকরাও হাজার গুণ বেশি দামে জমি বিক্রি করছে। অথচ এ সব বিষয় দেখভালের কেউ নেই বললেই চলে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য— এক সময় আসবে এলাকায় কোন কৃষিজমি দেখা যাবে না। বাজার থেকে কিনে এনে ধান দেখতে হবে। এছাড়া উপজেলার কাউলিয়া ও হযরতপুর ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি সবজি উৎপাদন হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে রাজধানীতে সবজির মোট চাহিদার চার ভাগের এক ভাগ আসে এ এলাকা থেকে। আলু, মুলা, টমেটো, বেগুন, ধনেপাতা, ডাঁটা, লাউ, নানা প্রজাতির শাক, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা এমন কোন সবজি নেই যা কেরানীগঞ্জে উৎপাদন হয় না। কিন্তু দিন দিন কৃষিজমি কমায় সবজি উৎপাদনও কমছে। কমছে কৃষকের আয়। এককালীন জমি বিক্রি করে সবাই নিজেদের গুটিয়ে নিচ্ছেন। জমি বিক্রি হওয়ায় বদলে যাচ্ছে কৃষকের পেশা। স্থানীয় বাসিন্দা আলাউদ্দিন জানান, ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি এই এলাকা সবজির জন্য প্রসিদ্ধ। সময়ের কারণে কৃষিজমি কেনার হিড়িক পড়েছে। হচ্ছে শিল্পায়ন। দ্রুত বেহাত হচ্ছে কৃষিজমি। এক সময় মাঠে আর সবজির দেখা মিলবে না।

3

কৃষিজমিতে ভূমিখেকোদের আগ্রাসন ৩ ॥ ভালুকায় বর্জ্য দূষণে সাড়ে ৫শ্র হেক্টর জমিতে এখন ফসল ফলে না

০ হদিস নেই সাড়ে চার শ্র হেক্টর পতিত জমির

০ জলাভূমি হাতেগোনা

০ মরতে বসেছে একদার খিরু নদী

রাজন ভট্টাচার্য ॥ ভালুকার ১১টি ইউনিয়নের মধ্যে আটটি ইউনিয়নের কৃষিজমি এখন আর খুব একটা ফাঁকা নেই। দিন দিন খোলা মাঠ আর সবুজ প্রান্তর কমে আসছে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, দখল, বিক্রিসহ নানা কারণে অকৃষি খাতে যাচ্ছে ফসলের জমি। দখল আর বিক্রির কারণে প্রাকৃতিক জলাভূমিও এখন হাতে গোনা। সরকারী হিসেবে প্রায় ৩০ বছরে ফসলি জমি কমেছে আট হাজার হেক্টরের বেশি। প্রায় সাড়ে ৪০০ হেক্টর পতিত খাস জমির হদিস নেই। যে যার সুবিধামতো এই জমি

দখলে নিয়েছে। অনেক সময় প্রশাসনের অজান্তেই বেহাত হয়েছে জমি। দখল আর দূষণের মুখে মৃতপ্রায় এক সময়ের খরস্রোতা খিরু নদী। স্থানীয় কৃষি বিভাগের দাবি, সম্প্রতি ১৫ ভাগ কৃষিজমি হ্রাস পেয়েছে। ভরাডেবা এলাকায় অবস্থিত এক্সপেরিয়েন্স মিলের দূষিত বর্জ্যে ইতোমধ্যে সাড়ে পাঁচ শতাধিক কৃষকের ৩৫০ হেক্টর জমিতে আর ফসল হচ্ছে না। প্রশাসন বলছে, কৃষিজমি সুরক্ষায় আইন না হওয়া পর্যন্ত কিছু করার নেই। কেউ জোর করে জমি দখল করে শিল্পকারখানা স্থাপন করতে চাইলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

জানতে চাইলে ভালুকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কামরুল আহসান তালুকদার জনকণ্ঠকে বলেন, দিন দিন এলাকায় কৃষিজমি কমছে, তা সত্য। বাস্তবতা হলো, ব্যক্তিমালিকানাধীন কোন জমি কেউ বিক্রি করলে আমাদের করণীয় কিছু থাকে না। তিনি বলেন, যে পর্যন্ত কৃষিজমি সুরক্ষা আইন পাস না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জমি রক্ষায় প্রশাসনিক কোন উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। আইনের বিভিন্ন দিক থাকবে, সেসব দিক বিবেচনা করেই জমি রক্ষায় উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হবে। আইনে কৃষিজমি অকৃতি খাতে যেন না যেতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। আমরা চাই দ্রুত আইনটি পাস করা হোক।

তিনি বলেন, কেউ নিজ থেকে যোগাযোগ না করলে আমরা জানতেও পারি না জমি বিক্রির কথা। ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে আপোসের মধ্য দিয়েই জমি বিক্রি হয়ে থাকে। জোর করে জমি দখলের পর সেখানে কেউ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চাইলে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি। এ ধরনের কোন অভিযোগ পেলে অবশ্যই কৃষিজমি রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

১৯৯০ দশকের হিসেব মতে ভালুকায় আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ২৭ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। এর মধ্যে আমন, বোরো, সবজি ও ফলের চাষযোগ্য জমি ছিল পুরোটাই। বর্তমানে তা হ্রাস পেয়ে সেচকৃত ১৯ হাজার ৫০০ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে। বনভূমি রয়েছে ৯ হাজার ২২৭ হেক্টর এবং পতিত জমি ৪২৫ হেক্টর। অর্থাৎ ১৫ শতাংশ আবাদি জমি হ্রাস পেয়েছে বলে কৃষি বিভাগের দাবি।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ভালুকা অংশ (মাস্টারবাড়ি নাসির গ্লাস থেকে ভরাডোবা নিশিন্দা বিএসবি স্পিনিং মিল পর্যন্ত ২২ কিলোমিটার কৃষিজমি শিল্পায়নের কারণে এখন আর চেনার উপায় নেই। কৃষিজমিতে গড়ে ওঠা শিল্প কারখানার মধ্যে রয়েছে ভরাডোবার নিশিন্দা এলাকায় বি এস বি স্পিনিং মিল, কৃষিবিদ গ্রুপ, বাশার স্পিনিং মিল, এক্সপেরিয়েন্স টেক্সটাইল মিল, মুলতাজিম স্পিনিং মিল, সীমা স্পিনিং মিল, প্যাট্রিয়ট স্পিনিং মিল, ঢাকা কটন মিল, (কাঠালি) রাসেল স্পিনিং মিল, (ধামশুর) কনজিউমার নিটসহ অন্তত শতাধিক কারখানা আবাদি জমির ওপর গড়ে উঠেছে।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের দুই পাশে ভালুকা অংশে ব্যাপকভাবে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আইন অমান্য করে জলাভূমি ভরাট হচ্ছে। এসব জমিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হবে। সে প্রস্তুতিই চলছে জোরেসোরে। এদিকে ভরাডোবা এলাকায় অবস্থিত এক্সপেরিয়েন্স মিলের দূষিত বর্জ্যে ইতোমধ্যে ৫৫০ কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং জমির পরিমাণ ৩৫০ হেক্টর।

পরিবেশ অধিদফতর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ভর্তুকি হিসেবে মিল কর্তৃপক্ষকে এক কোটি ৪৯ লাখ টাকা জরিমানাও করেছে। তাছাড়া খিরু নদী পুরোটাই ধ্বংস করে ফেলেছে পৌর এলাকায় অবস্থিত শেফার্ড ডায়িং ইন্ডাস্ট্রিজ, আর্টি ডায়িংসহ কয়েকটি ডায়িং ফ্যাক্টরির বিষাক্ত বর্জ্য।ে এসব ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ তাদের ইটিপি স্থাপন করলেও খরচ বাঁচানোর জন্য অধিকাংশ সময়ই ইটিপি বন্ধ রাখে এবং এই দূষিত বর্জ্য সরাসরি খিরু নদীতে ফেলছে।

শিল্প এলাকা হবিরবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম জনকণ্ঠকে বলেন, চীনে ব্যাপকহারে শিল্পায়ন হচ্ছে। আমাদের দেশের শিল্পায়নের বিকল্প কিছু নেই। নিজ এলাকায় শিল্পের কারণে কৃষিজমি বেহাত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কৃষিজমি তেমন একটা কমেনি। কৃষকের জমি তাদেরই আছে। তাহলে শিল্পায়ন কোথায় হচ্ছে? এমন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। মোর্শেদ আলম পরে বলেন, কৃষিজমি কিছু কমলেও মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। কেউ কষ্টে নেই।

এলাকার অনেকেই সামান্য জমি বিক্রি করে ব্যবসাবাণিজ্য করে ভাল আছেন। কৃষিজমি হ্রাস বিষয়ে ভেবে লাভ নেই বলেও পরামর্শ দেন এই চেয়ারম্যান।

১১ ইউনিয়নই ছিল কৃষিনির্ভর ॥ ভালুকায় ইউনিয়নের সংখ্যা ১১। এক সময়ে সব ইউনিয়নেই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ছিল। এখন পুরো উপজেলায় কৃষিনির্ভর অর্থনীতি বলা যাবে না। আগে শিল্প। তারপর কৃষি। রাজধানীর খুব কাছাকাছি এই থানা। এছাড়া ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ায় এলাকার জমিতে শিল্প স্থাপনের রীতিমতো ধুম চলছে। তবে তা আজ থেকেও নেই। অন্তত ২০ বছর ধরে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উপজেলার ১১ ইউনিয়নের মধ্যে এখন পর্যন্ত শিল্পায়ন হয়নি এর সংখ্যা তিনটি। এগুলো হচ্ছে ডাকাতিয়া, কাচিনা ও উথুরা ইউনিয়ন। এর বাইরে আট ইউনিয়নের বেশিরভাগ কৃষিজমি এখন বেহাত হয়ে গেছে।

এছাড়াও ভরাডোবা, হবিরবাড়ি ইউনিয়নের বনের জমি বেহাত হয়েছে অনেক। জমি উদ্ধারে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন তৎপরতা নেই। অভিযোগ আছে, প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ভূমিদস্যু চক্র নানা কায়দার এসব জমি হাতিয়ে নিয়েছে; যাকে বলে জীবনের জন্য দান। অফেরতযোগ্য। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মল্লিকবাড়ি কৃষি অধ্যুষিত এলাকা হলেও এখন আর সেই চিত্র নেই। বদলে গেছে এই ইউনিয়ন পরিষদের মাটির প্রকৃতি। ভরাডোবা এলাকায় নির্মিত এক্সপেরিয়েন্স টেক্সটাইলের প্রায় পুরো জমিতেই এক সময় আবাদ হতো। একই ইউনিয়নের যেখানে ঢাকা কটন মিল করা হয়েছে সেখানে পুরোটাই ছিল ডোবা। ধানও হতো প্রচুর। জমি কেনার পর অন্য জায়গা থেকে মাটি এনে ভরাট করা হয়েছে।

খিরু নদীর কান্না ॥ উপজেলায় নদী একটিই। নাম্মু খিরু। সকলের কাছে প্রিয় নাম এটি। নদীর পরিচিতিও বেশ। যারা একটু প্রকৃতিপ্রেমিক তাদের কাছে নদী নিয়ে ইতিহাস আর গল্পের যেন শেষ নেই। এক সময় খরস্রোতা ছিল নদিটি। দখল, দূষণে নদীটি এখন বেহাল। নাব্য নেই। বর্ষায়ও আগের মতো গর্জন হয় না। হারিয়ে গেছে জীববৈচিত্র্য। বর্ষার কয়েকমাস নৌকার দেখা মিললেও শুকনো মৌসুমে নদীর অনেক স্থানই শুকিয়ে যায়। হেঁটে পারাপার হন স্থানীয় লোকজন।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, এক সময় নদীর দুপারে অনেক ধানচাষ হতো। ভূমিহীন বা সাধারণ কৃষক নিজেদের মতো করে ধান চাষ করত। নদীর দুপারে এখন অবৈধ স্থাপনার শেষ নেই; যে যার মতো নদীর জায়গা দখলে নিয়েছে। নির্মাণ করেছে বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বসতবাড়ি। পার ঘেঁষে যাদের বাড়ি তারা নিজের মনে করেই দখলে নিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের জমি। কে দেখবে এসব। অর্থাৎ বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার কেউ নেই।

স্থানীয় লোকজনের ভাষায়, কোথাও ফাঁকা থাকলেও এখন নদীর জমিতে চাষের কোন সুযোগ নেই। এলাকায় যত মিল ফ্যাক্টরি হয়েছে তার বেশিরভাগেরই বর্জ্য বিশুদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যরে লাইন দেয়া হয়েছে নদীতে। ফল হলো- নদীর পানির রঙ বদলে গেছে। স্বাভাবিক রং হারিয়ে পানি রঙিন হয়েছে। কৃষকের ভাষ্য, রঙিন পানি কৃষিকাজে ব্যবহারের অযোগ্য। পানি বিষাক্ত হওয়ায় জীববৈচিত্র্যও ধ্বংস হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে ১০ বছর পর নদীটির অস্তিত্ব থাকবে কিনা এ নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে মৃত খিরু নদী কাঁদছে। বার বার বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে।